রাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিকাঠামো কোথায় দাঁড়িয়ে?

সুদর্শন কুণ্ডু

নিস্কন্টক প্রতিবাদহীন দূর্নীতির দুর্বৃত্তায়ন শুধুমাত্র ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্ব নষ্ট করছে তাই নয়। এটা আজ দেশের সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। রাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিকাঠামো একটা মিথ্যা প্রতিশ্রুতির মধ্যে দুর্বিসহ অবস্থায় দাড়িয়ে আছে। সাধারণ মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা -চাহিদা-অধিকার সবই ধোঁয়াশায় ভরা। প্রতিবাদহীন অসহায় মানুষ গুলো বুভুক্ষের মত ছুটে বেড়াচ্ছে শুধুমাত্র অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের আশায়।

বিনয়, বাদল, দীনেশের প্রতিবাদী চরিত্রে বৈপ্লবিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ। আবার সুভাষ চন্দ্র বসু ও মহত্মা গান্ধীদের স্বাধীনতার আন্দোলনে আত্ম বলিদানের ইতিহাস যে মহান ভারতবর্ষ উপহার দিতে চেয়েছিল তা আজ ভাষাহীন ক্রন্দনে নিরবে নিভতে কাঁদছে। প্রতিবাদী কন্ঠের নির্লিপ্ততা আজ ভারতবাসীর মজ্জাগত। দেশ স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলির মৌলিক চিন্তা ভাবনায় স্বজন-পোষণ ও দ্রীতি কায়েম প্রণালী একটা অলিখিত প্রচ্ছন্ন প্রশয় মাত্র। রক্তচক্ষুর সাথে প্রশাসনিক ক্ষমতার ব্যবহার প্রতিবাদী চরিত্রগুলোকে নিথর ও নির্জীব করে রেখেছে। সাধারণ মানুষ রাজনীতিতে তাদের উত্সাহ হাড়িয়েছেন। সমাজের একটা শ্রেণী মাটির মানুষদের পায়ের নিচে পিষে তারা মাথা তুলতে তুলতে আকাশ ছুঁয়ে সূর্য্যকেও চোখ রাঙাচে চাইছে। আর এই সত্যটাই মানুষের কাছে প্রতিনিয়ত প্রতিফলিত হচ্ছে। আসলে জগতে যা সত্য হওয়া উচিত নয় তাও কখনো সত্য হয়। বিশ্বাস সন্দেহের দ্বারা অভিভত হলে মন যখন সমর্থন করে তখনই অবসাদ আসে, সমাজের প্রতিবাদী চরিত্রের মধ্যে সন্দেহের দানা বেঁধেছে, তাই সমাজের সর্বস্তরে সচেতন মানুষগুলোর মধ্যে অবসাদের আঁচ লাগতে শুরু করেছে। আয়নায় মুখ দেখে আমরা ভয় পাই, সে কি প্রতিবাদী মুখ? না কি শতগুণে মূক? কি সুখে? প্রতিবাদ মানে আজ দেখি শুধু মোমবাতি স্বলে যায়-গলে যায় দিনরাত। প্রতিবাদ শব্দটা কি একদিন মুছে যাবে বাংলা অভিধানে? আমরা কী ঘরে বাইরে সোচ্চার প্রতিবাদে গা এলাতে ভুলে গেছি? বাস্তবিক জীবনে এই না কথা বলতে পারার শত সহস্র অনুকম্পন প্রতিবাদী চরিত্রগুলোকে নিস্প্রদীপ করে রাখছে। আমার গর্বের দেশ আজ রন্ধ্রে রন্ধ্রে দূর্নীতিতে আক্রান্ত, খেলাধূলা, রেল, প্রশাসনিক,

প্রতিরক্ষা প্রভতির সর্বত্রই একই চিত্র। দূর্নীতির স্তর বিন্যাসে দুরের নাগাল পাওয়া সাধারণের কম্ম নয়। মানুষ দেখছে, বুঝছে, জানছে কিন্তু প্রতিবাদী মুখগুলো মুখোশধারীদের ভীড়ে কেমন মাফিয়া চক্রের অবাধ দূর্নীতিতে প্রতিবাদ করার অর্থ মহা প্রলয়ের সম্মুখীন হওয়া। সম্প্রতি দুই আই.এ.এস দূর্গাশক্তি নাগপাল কিংবা, ইউনিস খান মাফিয়া দ্বারা পরিচালিত না হওয়ার কারণে প্রাণ সংশয়ের সম্মুখীন, যদিও বাঙালী এখন আর ক্ষুদিরাম হতে চায় না, বরং দুর্ভাগা ক্ষুদিরাম এখন উপহাসের পাত্র। সাধারণ মানুষের ক্ষমতা সীমিত। সরকারের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা আছে কারণ ১৩০ কোটির দেশে সচেতনতা এবং দায়বদ্ধতার মোরকে মুরে ফেলা বাস্তবতার নিরিকে বড়ই কঠিন। লোকপাল থেকে দিকপালদের অভিমুখ যখন ঘুরে যায় স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে সকল প্রতিবাদের ঢং এবং রং ভিন্ন হলেও চরিত্রটা একই। গণতন্ত্রে প্রতিবাদেক শেষ অস্ত্র বন্ধ। কিন্তু সেটা লালন পালন করা গণতন্ত্রে কাম্য নয়। সর্ব সাধারণের গণতান্ত্রিক প্রতিবাদে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের উপস্থিতি সাধারণের একটা বড় অংশকে ভুল পথে চালিত করে, ফলে আন্দোলনের স্তিমিত রূপ ঐ অংশকে ক্রমশ প্রতিবাদ বিমুখ করে তোলে। সাধারণের কন্ঠরোধে রাজনীতির কারবারীরা অনেক বেশি বদ্ধ পরিকর।

ছোট ছোট বিভিন্ন আঞ্চলিক সমস্যা, কখনও ভাষা সংস্কৃতির দাবি, আবার কখনও আত্ম পরিচয়ের প্রকাশের দাবি, কখনও জাতী সত্বার দাবি সংগঠিত করে সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, নয়ডা, তেলেঙ্গানা বা গোর্খাল্যান্ডের মত প্রতিবাদী আন্দোলন গুলোকে। আর এই আঞ্চলিক সমস্যা গুলো এখন সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যা নির্ভর হয়ে পড়েছে। আর এই আঞ্চলিক সমস্যা গুলি মেটাতে ব্যর্থ সরকারের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা প্রতিবাদী মঞ্চ হয় বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তি, কোথাও মাওবাদী আর না হলে জন্ম দেয় উগ্রপন্থার। তারপর শুরু হয় রাষ্ট্রীয় শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দমনপীড়ন নীতি, ফলে হাড়িয়ে যায় প্রতিবাদের ভাষা। প্রতিবাদী মানুষ গুলো না পারে মূলস্রোতে ফিরতে, না পারে প্রাপ্য আদায় করতে। আর এরই মাঝে পড়ে সাধারণের প্রাণ ওষ্ঠাগত।

সব চাইতে আশ্চর্য্যের বিষয় সাতষট্টির স্বাধীনত্তোর কালে একজন নাগরিকের নুন্যতম চাহিদা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, রাস্তাঘাট, পানীয় জল, বৈদুযতিকরণ, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি আর এই সাংবিধানিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে গড়ে ওঠা প্রতিবাদী মঞ্চ থেকেই সরকারী ঔদাসীন্য তার প্রচার পায়। আর এই প্রতিবাদী মঞ্চে সামিল অনগ্রসর শ্রেনীকে ব্যবহার করে গড়ে ওঠে স্বার্থান্বেসি পুঁজিপতির দালাল, যারা রাজনীতির কারবারিকের সাথে মিলে মিশে সাধারণের সর্বৈব ক্ষতি সাধন করে থাকে। অন-উন্নয়নের আওয়াজ তুলে কাশ্মীরের অনগ্রসর শ্রেনীকে পাকিস্তানের সাহায্যদান, কিছুক্ষেত্রে ধর্মীয় উন্মাদনা ভারতীয়কে পাকিস্তানি

করে তোলে। স্টিভ ওয়ার মত বরেণ্য খেলোয়াড় মত সংস্থাকে আর্থিক সাহায্য দানের বিনিময়ে ভারতীয়কে অস্ট্রেলিয়ান করে তোলে। নিরন্ন দেশে ক্ষুধার অন্ন যে, কারওর ভোগের অন্ন হবে এটাই স্বাভাবিক। এ সকল ক্ষেত্রে প্রতিবাদ বিমুখ পরিবেশই গড়ে ওঠে। এদেশের মুসলিম সমাজের একটা বড় অংশ পাকিস্তানের হয়ে গলা ফাটায়, যা ভারতীয় ক্রিকেটের লজ্জা।

ছোট ছোট বিভিন্ন আঞ্চলিক সমস্যা, কখনও ভাষা সংস্কৃতির দাবি, আবার কখনও আত্ম পরিচয়ের প্রকাশের দাবি, কখনও জাতী সত্বার দাবি সংগঠিত করে সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, নয়ডা, তেলেঙ্গানা বা গোর্খাল্যান্ডের মত প্রতিবাদী আন্দোলন গুলোকে। আর এই আঞ্চলিক সমস্যা গুলো এখন সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যা নির্ভর হয়ে পড়েছে। আর এই আঞ্চলিক সমস্যা গুলি মেটাতে ব্যর্থ সরকারের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা প্রতিবাদী মঞ্চ হয় বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তি, কোথাও মাওবাদী আর না হলে জন্ম দেয় উগ্রপন্থার। তারপর শুরু হয় রাষ্ট্রীয় শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দমনপীড়ন নীতি, ফলে হাড়িয়ে যায় প্রতিবাদের ভাষা। প্রতিবাদী মানুষ গুলো না পারে মূলস্রোতে ফিরতে, না পারে প্রাপ্য আদায় করতে। আর এরই মাঝে পড়ে সাধারণের প্রাণ ওষ্ঠাগত।

সব চাইতে আশ্চর্য্যের বিষয় সাতষট্টির স্বাধীনত্তোর কালে একজন নাগরিকের নুন্যতম চাহিদা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, রাস্তাঘাট, পানীয় জল, বৈদ্যুতিকরণ, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি আর এই সাংবিধানিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে গড়ে ওঠা প্রতিবাদী মঞ্চ থেকেই সরকারী ঔদাসীন্য তার প্রচার পায়। আর এই প্রতিবাদী মঞ্চে সামিল অনগ্রসর শ্রেনীকে ব্যবহার করে গড়ে ওঠে স্বার্থান্বেসি পুঁজিপতির দালাল, যারা রাজনীতির কারবারিকের সাথে মিলে মিশে সাধারণের সর্বৈব ক্ষতি সাধন করে থাকে। অন-উন্নয়নের আওয়াজ তুলে কাশ্মীরের অনগ্রসর শ্রেনীকে পাকিস্তানের সাহায্যদান, কিছুক্ষেত্রে ধর্মীয় উন্মাদনা ভারতীয়কে পাকিস্তানি করে তোলে। স্টিভ ওয়ার মত বরেণ্য খেলোয়াড় মত সংস্থাকে আর্থিক সাহায্য দানের বিনিময়ে ভারতীয়কে অস্ট্রেলিয়ান করে তোলে। নিরন্ন দেশে ক্ষুধার অন্ন যে, কারওর ভোগের অন্ন হবে এটাই স্বাভাবিক। এ সকল ক্ষেত্রে প্রতিবাদ বিমুখ পরিবেশই গড়ে ওঠে। এদেশের মুসলিম সমাজের একটা বড় অংশ পাকিস্তানের হয়ে গলা ফাটায়, যা ভারতীয় ক্রিকেটের লজ্জা।

সমাজে বাস করতে গেলে কোনরুপ অন্যায়ের প্রতিবাদ করা ব-কলমে নিষিদ্ধ হয়েছে, কারণ প্রতিবাদী কন্ঠ সমাজ সংস্কারকদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে থাকে। তাই এরা প্রতিবাদী চরিত্রগুলোকে সামাজিকভাবে প্রতিবন্দি করে রেখে দেয়। এমনকি সংগঠন বা দল পরিচালনার ভিন্ন মতাদর্শীরা প্রতিবাদে বিরত না থাকলে

মানসিক রোগের শিরোপাও অর্জন করতে পারেন, মুখে রামমোহন, কার্যে সীতা হরণ।

স্বাধীন ভারতের সংবিধানে নাগরিকদের রাষ্ট্রের সব রকম অধিকার দেওয়া হয়েছে, আগামীতে আরও ৬৮টি অধিকার সংযোজিত হওয়ার লক্ষ্যে। কিছু আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সরকারী কাজকর্ম পরিচালনায় সরকারি আনুকূল্যের বিনিময়ে স্থায়িত্ব, সুযোগ সুবিধা আদায় করে নেওয়াটাই রীতি। সুতরাং সরকারের কৃতকর্মের প্রতিবাদে গিয়ে সরকারি সাহায্য সাধারণের মধ্যে পেঁৗছে দিয়ে সরকারের বিরাগভাজন হওয়ার দায় বহন করার সামর্থ্য ঈশ্বর আমলাদের দেননি। অতএব প্রতিবাদী আমলা বিরল হয়েই বিরাজমান।

সমাজে নারীদের অবমাননা, লাঞ্ছনা, বলাত্কার, ধর্ষণ এটা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, ৬৭-র স্বাধীনোত্তরকালে পেঁৗছিয়ে আমাদের মা-বোনেদের সম্ভ্রম রক্ষায় প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে আমরা প্রতিবাদের ভাষা হারাতে বসেছি। প্রতিবাদের প্রতীক সলমন রুশদি অথবা তসলিমা নাসরিনদের কলমগুলোও আজ স্বার্থান্বেসীদের নিশানায়, তাই তাদের দেশে ঠাঁই নেই। সব ধরনের প্রতিবাদী আন্দোলনের প্রধান দাবী থেকে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে ন্যায় পাওয়ার অধিকার, আর সেই অধিকারের দাবী আদায়ে সোচ্চার কলমগুলো ও মুখোশের আড়ালে অন্তরীন হয়ে পড়ছি। নিঃপীড়িত মেয়েরা বিয়ে ভাঙার চাইতে আত্মহত্যাকে সম্মানের মনে করছে। এই সামাজিক ব্যাধি রোধে প্রতিকার কি? এদের রুদালির কান্না কে থামাবে? নৈতিকতার প্রতি, বিবেকের প্রতি, দায়বদ্ধতার মানবিক মুখ আজ বিবেক বর্জিত, নীতিভ্রষ্ট বোঝাপড়ার অপপ্রয়াসের অমানবিক মুখে পরিণত হয়েছে তারই প্রতিফলন আজ সমাজে প্রতিফলিত হচ্ছে। সমাজের সামগ্রিক চরিত্রের বদল ঘটে গেছে। তাই অনায়াসে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দাঁত চুরি হয়, রবীন্দ্রনাথের নোবেল চুরি যায় আর আমরা নির্বিকার নির্লিপ্ত ব্রত পালন করে যাই। জানি না, এর শেষ কোথায়...।